মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষঃ গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

ভূমিকা

মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষ ধারণাটা আমাদের দেশে একেবারেই নতুন। এমনকি অনেকে হয়তো মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষ শব্দটার সঙ্গে খুব বেশি পরিচিতও নন। গলদা চিংড়ির ইউনিট প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গলদা চিংড়ি চাষের এই নতুন কলাকৌশল সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। এদেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ গলদা চিংড়ি চাষের জন্য খুবই উপযোগী হওয়ায় আমাদের দেশে গলদা চাষ দ্রুত সমপ্রসারিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে গলদা চিংড়ি চাষ খুবই লাভজনক হওয়ায় তা চাষিদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে গলদা চিংড়ি চাষের অবদান অনস্বীকার্য। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে মৎস্য খাতের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ২৩% এসেছে গলদা চিংড়ি থেকে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১,৪৫,০০০ হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। আর সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত আছে কয়েক লক্ষ শ্রমিক। সত্তর এর দশক হতে আমাদের দেশে গলদা চিংড়ি চাষ শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, পিরোজপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় চিংড়ি চাষ সমপ্রসারিত হয়েছে এবং প্রতিদিন নতুন নতুন চিংড়ি ঘের তৈরি হচ্ছে। মিঠা পানিতে এই চিংড়ি চাষ করা যায় বলে এটি বাংলাদেশের টেকনাফ হতে শুরু করে তেতুলিয়া পর্যন্ত যে সমস্ত জলাশয়ে বছরের ৬ মাস বা অধিক সময় ২-৩ ফুট পর্যন্ত পানি থাকে সেখানে গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়। তাই অমিত সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। গলদা চিংড়ি চাষের আধুনিক কলাকৌশল ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বিশ্বের অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় আমাদের দেশের গড় উৎপাদন অনেক কম। আমাদের দেশের চাষিরা এখন পর্যন্ত সনাতন বা উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে গলদা চাষ করে আসছেন। যার ফলে গলদা চিংড়ি ঘেরের আয়তন বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন কাঙ্খিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসের উপর যে চাপ পড়ছে তা মোকাবিলার জন্য ইউনিট প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। তাই মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষ একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। এই পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে মৎস্য শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে গলদা চিংড়ির বার্ষিক উৎপাদন বর্তমান উৎপাদনের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষের ধারণা ও গুরুত্ব

মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষ বলতে আলাদা আলাদা ভাবে শুধুমাত্র পুরুষ গলদা বা স্ত্রী গলদা চিংড়ি চাষ বুঝায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ গলদা চিংড়ি চাষি ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ করে থাকেন। বোরো ধান কাটার পর চৈত্র-বৈশাখ মাসে পুকুর তৈরি করে গলদার রেণু (পুরুষ-স্ত্রী একত্রে) ছাড়েন এবং শীত আসার আগে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ/পৌষ মাসে চিংড়ি ধরে বিক্রি করেন। সেক্ষেত্রে ৬-৮ মাস পর্যন্ত গলদা চিংড়ি চাষের সময়। অনেক সময় সময়মতো রেণু (গলদা চিংড়ির পিএল) না পাওয়া বা চাষির ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ঘেরে রেণু ছাড়তে দেরি হয় সেক্ষেত্রে চাষের সময় আরো কমে যায়। ফলে এই সময়ে চাষকৃত সকল গলদা চিংড়ি বিক্রির উপযোগী হয় না (স্থানীয় ভাষায় গ্রেডে আসে না)। সে ক্ষেত্রে চাষি আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হন। এমনকি অনেক সময় চাষি গলদা চিংড়ি চাষে উৎসাহও হারিয়ে ফেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে মানোসেক্স পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে এ সকল সমস্যা দূর করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গলদা চিংড়ির মধ্যে পুরুষ গলদা স্ত্রী গলদা চিংড়ির তুলনায় অতি দ্রুত বাড়ে ও ওজন অনেক বেশি হয়। প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত একটি পুরুষ গলদা চিংড়ির ওজন ৪০০-৪৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে স্ত্রী গলদা চিংড়ি ওজনে সর্বোচ্চ ১২০-১৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। তাও অনেক সময়ের প্রয়োজন। গলদা চিংড়ি চাষে চাষিকে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। আর তা হলো গ্রেডিং পদ্ধতি। গ্রেডের সামান্য তারতম্যের কারণে চাষি আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একটি গলদা চিংড়ির ওজন (মাথাসহ) ৯০ গ্রাম। স্থানীয় গ্রেডিং পদ্ধতিতে এটি ২০ গ্রেডের মাছ এবং বর্তমান বাজার দর (২০ গ্রেডের মাছ ৪৫০ টাকা প্রতি কেজি) হিসাবে ঐ মাছটির দাম হবে ৪০.৫০ টাকা।

অন্যদিকে ঐ মাছটি আর মাত্র ১০ গ্রাম বেড়ে ১০০ গ্রাম হলে সেটি হবে ১০ গ্রেডের মাছ এবং বর্তমান বাজার দর (১০ গ্রেডের মাছ ৬৫০ টাকা প্রতি কেজি) হিসাবে ঐ মাছটির দাম হবে ৬৫ টাকা অর্থাৎ একটি মাছের ১০ গ্রাম ওজনের ব্যবধানে দামের পার্থক্য হচ্ছে ২৪.৫০ টাকা। আমাদের দেশের চাষিরা এই একটি ক্ষেত্রে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। মনোসেক্স (সমস্ত পুরুষ) গলদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে যেমন প্রতিটি গলদা চিংড়ির একক ওজন বৃদ্ধি পায় তেমনি সামগ্রিক উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এতে করে চাষি দুই দিকে উপকৃত হন।

১) প্রতিটি গলদা চিংড়ির একক ওজন বৃদ্ধির ফলে গলদা চিংড়ির আপ গ্রেডেশন ঘটে। আবার উচ্চতর গ্রেডে দামের অনেক বেশি পার্থক্য ঘটে। এক্ষেত্রে চাষি দারুণ উপকৃত ও লাভবান হতে পারেন।

২) সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে নীট মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মানোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষের কলাকৌশল

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষ মূলত সকল পুরুষ গলদা বা সকল স্ত্রী গলদা চিংড়ির পৃথক পৃথক চাষ পদ্ধতি। মনোসেক্স গলদা চাষ পদ্ধতিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বিশেষ করে যখন স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করা হয়। এখন পর্যন্ত হ্যাচারীতে ১০০% পুরুষ বা ১০০% স্ত্রী গলদা চিংড়ির রেণু উৎপাদনের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। রেণু (পিএল) অবস্থায় গলদা চিংড়ির স্ত্রী-পুরুষ একত্রে থাকে এবং তা স্বাভাবিকভাবে পৃথক করা সম্ভব হয় না। এজন্য স্ত্রী-পুরুষ একত্রে নার্সারী পুকুরে চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে গলদা চিংড়ি চাষে রেণু হতে কিশোর চিংড়ি (স্থানীয় ভাষায়-পিচ বলে) পর্যায় পর্যন্ত আসতে প্রায় ২ হতে আড়াই মাস বা কখনও কখনও তিন মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়। পরবর্তীতে চিংড়ি বিক্রি করতে আর মাত্র তিন মাস সময় বাকী থাকে। কারণ শীত শুরুর আগে চিংড়ি বিক্রি করতে না পারলে অনেক চিংড়ি ঘেরে পানির স্বল্পতা দেখা দেয় এবং শীতে চিংড়ি দৈহিক বৃদ্ধি হয় না বললেই চলে। তাই চাষিরা শীত মৌসুম শুরুর প্রাক্কালে ঘের হতে চিংড়ি বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু যদি পিস হতে সময় বেশি লাগে তাহলে অবশিষ্ট সময়ে চিংড়ি কাঙ্খিত গ্রেডে পৌঁছায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য নার্সারী ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। আবার অনেক চাষি রেণু নার্সারী না করেই সরাসরি ঘেরে ছেড়ে দেন। বিষয়টি মোটেও ঠিক নয়। নার্সারী পুকুরে উপযুক্ত পরিবেশ ও

উন্নত পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রেণুকে যত দ্রুত সম্ভব পিচ (কিশোর) চিংড়িতে পরিণত করা প্রয়োজন। সাধারণত নার্সারী পুকুরে প্রতি শতাংশে ১০০০টি রেণু ছাড়া ভাল। রেণুর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য উচ্চ প্রোটিন মান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা দরকার। নার্সারী পুকুরে চিংড়ি কিশোর অবস্থায় পৌছালে এটিকে পুরুষ-স্ত্রী আলাদা করা হয়। পূর্ণাঙ্গ গলদা চিংড়ির স্ত্রী-পুরুষ চেনার অনেক উপায় আছে যেমন স্ত্রী গলদা চিংড়ির চেয়ে পুরুষ গলদা চিংড়ি বেশি বাড়ে। তাই একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে খানিকটা বড় হয়। শিরোবক্ষ (Cephalothorax) আকারে মোটা এবং বড় হয় আর নিম্নোদয় (Abdomen) অপেক্ষাকৃত সরু দেখায়। পুরুষ চিংড়ি সহজেই নজরে পড়ে এমন একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর দ্বিতীয় ভ্রমণপদ লম্বা, মোটা এবং দাঁড়া বিশিষ্ট। এই দ্বিতীয় বাহুর দ্বারা পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়িকে সঙ্গমকালে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখে। স্ত্রী চিংড়ির মাথা ও দ্বিতীয় বাহু অপেক্ষাকৃত অনেকটা ছোট থাকে এবং নিম্নোদয়ের তলার দিকে ডিম ধারণের জন্য নিম্নোদয় অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়। পিঠের খোলসগুলি বড় হয় এবং উভয় দিকে নেমে এসে ডিমগুলি ঢেকে রাখতে সাহায্য করে। পুরুষের জনন অঙ্গ পঞ্চম ভ্রমণপদের গোড়ায়, আর স্ত্রীর যৌন অঙ্গ তৃতীয় ভ্রমণপদের গোড়ায় অবস্থিত। পরিপক্ক স্ত্রীর মাথার নীচে ও পার্শ্বে গোলাপী রং/কমলা রং এর আভা দেখা যায়। পুরুষ চিংড়ির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, প্রথম উদর খন্ডের তলার খোলসের মাঝখানে একটা ছোট কাঁটার মত আর দ্বিতীয় সাঁতারের পায়ের ভেতরের দিকের পত্রের (Endopodite) গোড়ায় লোমের মত এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা (Appendix) দেখা যায়। জুভেনাইল অবস্থায় পরুষ চিংড়িকে এই এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা দেখেই সনাক্ত করতে হয়। কারণ তখন অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। তাই স্ত্রী-পুরুষ পৃথক পৃথক করা অনেকটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অভিজ্ঞ চাষি অতি সহজেই স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করতে পারেন। আমাদের দেশে অনেকে পরীক্ষামূলকভাবে মনোসেক্স গলদা চিংড়ি চাষ করছেন। সেক্ষেত্রে চাষিরা শুধুমাত্র পুরুষ গলদা চিংড়ি চাষে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। কারণ পুরুষ চিংড়ি স্ত্রীর তুলনায় অনেক দ্রুত বাড়ে। কিন্তু স্ত্রী গলদা চিংড়ি চাষেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ১১২.৫০ কোটি গলদা চিংড়ির পিএল এর প্রয়োজন। তাছাড়া গলদা চিংড়ির ঘেরের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে এ চাহিদা দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্তও প্রাকৃতিক উৎস যেমন বিভিন্ন নদ-নদী হতে সংগৃহীত গলদা চিংড়ির রেণুর উপর নির্ভর করা হচ্ছে যা মোটেও সমীচীন নয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমাদের অবশ্যই এই পন্থা পরিত্যাগ করে হ্যাচারীতে রেণু উৎপাদন ও ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মানসম্মত ব্রুড (ডিমওয়ালা স্ত্রী চিংড়ি) প্রয়োজন। নদীতে অতি আহরণের ফলে এই ব্রুডের পরিমাণ কমে গেছে উল্লেখযোগ্য হারে। তাই গলদা চিংড়ি শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড তৈরি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মনোসেক্স (শুধু স্ত্রী) গলদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড তৈরি করা যেতে পারে যা ভবিষ্যৎ রেণু উৎপাদন তথা গলদা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করবে।

মনোসেক্স ও মিশ্র গলদা চিংড়ি চাষের উৎপাদনের তুলনা

আমাদের দেশের চাষিরা সাধারণত গলদা চিংড়ির স্ত্রী-পুরুষ একত্রে চাষ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে চাষিরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, তাদের ঘেরে স্ত্রী চিংড়ির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন অনেক কমে গেছে। আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে যে পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে সেখানে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন ৬০০-৭০০ কেজি পাওয়া যায়। অনেক সময় এই উৎপাদন আরো কম হতে দেখা গেছে। অথচ আমাদের পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১২০০-১৫০০ কেজি পাওয়া যায়। থাইল্যান্ডে এই উৎপাদন আরো অনেক বেশি। তাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিদের পর্যায়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করলে উল্লেখযোগ্য সফলতা পাওয়া যেতে পারে। একই আয়তন ও আকারের দুইটি পুকুরে একই পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শুধু পুরুষ গলদা চিংড়ি এবং স্ত্রী-পুরুষ চিংড়ি একত্রে চাষ করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ একত্রে চাষ করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন পাওয়া যায় ৬৯০ কেজি। অন্য দিকে শুধু পুরুষ গলদা চিংড়ি চাষ করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন পাওয়া যায় ১১৩০ কেজি। এক্ষেত্রে নীট মুনাফা হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ১,৯৫,৪২০ টাকা এবং ৩,৪৯,০০০ টাকা পাওয়া যায় যা প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি।

উপসংহার

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে গলদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইউনিট প্রতি উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধু গলদা চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা না বাড়িয়ে যদি উৎপাদন দ্বিগুণ বা আরো অধিক বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। চাষি পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও সমপ্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। এ দেশের চাষিরা যতদিন পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী না হবে ততদিন পর্যন্ত কাঙ্খিত উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রদর্শণী খামার স্থাপনের মাধ্যমে চাষিদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় গলদা চিংড়ি চাষে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে চাষিদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

লেখক: সরোজ কুমার মিস্ত্রী
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া, নড়াইল।
তথ্যসূত্র: পোলট্রি, পশুসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'খামার'